Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 452 – 457
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ভারতীয় ঐতিহ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'

ধ্রুব মুন্সী
ইমেইল : munsidhruba@gmail.com

Keyword
স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্ত দর্শন, সময়, সমাজ, ধর্ম, মানুষ।

Abstract
বিবেকানন্দের মনন ও চিন্তনে ধর্মীয় ভাবনা নবরূপে প্রাপ্ত হয় বারংবার। ধর্ম কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় বরং মানুষের জীবন, কর্ম সমস্ত কিছু সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর ধর্মচিন্তার অন্যতম আলোচ্য বিষয় বেদান্ত দর্শন। তিনি বেদান্তের ধারণাকে শুধু দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে জুড়তে চেয়েছেন। প্রত্যহের জীবনে বেদান্তের ব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানব সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। আলোচ্য নিবন্ধে কীভাবে বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান মানবিক গুণকে বর্ধিত করতে পারবে এবং স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে বাংলার সমাজ জীবনে বেদান্ত দর্শনের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন তা আলোচনা করে দেখানো হবে।

Discussion
উনিশ শতক জাগরণের কাল। নতুন করে বেঁচে ওঠার তাগিদ শুরু হয় মানুষের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাবে একদল মানুষের চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। সমাজের অভ্যন্তরে বর্তমান নানা কুপ্রথা, নারীর অবরোধ জীবন সম্পর্কে সচেতন মানুষ সমাজ পরিবর্তনের কাজে এগিয়ে আসে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। একদিকে যেমন সমাজ পরিবর্তনের দিকে এগোয়, অন্যদিকে ভারতীয় ধর্মের মূল সম্পর্কে জাগতে থাকে প্রশ্ন। উনিশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নব মূল্যায়ন এবং ভারতীয় সাহিত্য দর্শনের প্রশংসা যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক ভাবনার সূচনা করে তেমনি মানুষও নতুন করে নিজেদের ধর্ম ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হন। সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনার প্রথম লক্ষণ ধরা পড়ে ধর্মীয় উপলব্ধির অনুসন্ধানে। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও তত্ত্ব বিগত প্রায়। রবীন্দ্রনাথ মূল স্রোতের অনুসন্ধান করলেন বৈষ্ণব ধর্ম ও বাউল লোকগানের মাধ্যমে। অন্যদিকে এমন এক মানুষ এসে দাঁড়ালেন যিনি হিন্দুধর্মকে তথা ভারতীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে চাইলেন। তিনি আর কেউ নন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি শুধু প্রাচ্যের মানুষের মধ্যে নয়, তুলে ধরলেন সুদূর পাশ্চাত্যে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্য আধ্যাত্মিকতায় নিহিত। তাই ভারতবাসীর জাগরণের জন্য তিনি বেছে নিলেন ধর্মকে। হিন্দু ধর্মের

প্রচলিত নীতি, আচার সমস্ত কিছুকে নতুন করে অনুসন্ধান করে ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। আধ্যাত্মিকতার বোধ জাগ্রত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। শুধু হিন্দুধর্মকে নতুন করে দেখা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পালনীয় আচার-আচরণ, ধারণা সমস্ত কিছুর তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে চাইলেন ভারতীয় ঐতিহ্য তথা আধ্যাত্মিকতার মূল স্বরূপকে। এই স্বরূপটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে। আমরা প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের ধর্ম ভাবনা তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি দেখেছিলেন আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টিতে, যা পাশ্চাত্যেও সঞ্চার করেছিল আশার আলো। তাঁর সাহস ও হিন্দু ধর্মের মূল্যায়ন ভারতীয় ঐতিহ্যের নতুন দ্বার খুলে দিয়েছিল সকলের মনে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার মূল্যায়ন করে জওহরলাল নেহেরু 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "... বিবেকানন্দ ভারতের অতীত গৌরবের উত্তরাধিকারে গর্বিত ছিলেন, তথাপি জীবনের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক এবং সেই কারণে তিনি ভারতের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ ছিলেন। হতাশা ক্লিষ্ট আত্মবিশ্বাসহীন হিন্দু মানসে তিনি নতুন বল ও আশার সঞ্চার করেছিলেন, তাকে আবার আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিলেন।... তিনি বৈদান্তিক অদ্বৈত দর্শনের একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন এবং তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে একমাত্র এই মতই ভবিষ্যতে চিন্তাশীল মানবের ধর্ম হতে পারে। কারণ বেদান্ত কেবল আধ্যাত্মিকতাই নয়, পড়ন্ত যুক্তিবাদী এবং বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অনুকূল।... বেদান্তের আদর্শ মানুষের একাত্মতা ও তার সহজাত দেবত্ব।... বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য প্রগতির সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।"[১]

ঐতিহ্য, একাত্মতা, যুক্তিবাদ এগুলি তার ভাবনার মূল স্বরূপ। বেদের ধর্মকেই তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মুখ্য বিন্দু হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা পাশ্চাত্যের প্রগতি ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মিল সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করে দেখেছেন পাশ্চাত্যে ধর্মের প্রাধান্য এবং ভারতে মোক্ষের। একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে দুটি বস্তু পৃথক নয়। দুটির সমন্বয়েই সঠিক বোধে উত্তরণ সম্ভব। ধর্ম অর্থাৎ

> "যা ইহলোক বা পরলোকের সুখ ভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।"[২]

আর মোক্ষ হল সেই বস্তু "যা শেখায় যে ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।"[৩] ইহলোক পরলোক সবই প্রাকৃতিক নিয়মের উর্ধ্বে নয়। সুখের অভীপ্সা করা অর্থাৎ দাসত্বকে স্বীকার করা। এই মোক্ষ সেই দাসত্বকে অস্বীকার করতে শেখায়। মায়ার বাঁধনে নির্মিত পৃথিবী। বন্ধন মুক্তিতেই প্রকৃত মুক্তি। বিবেকানন্দের মতে একমাত্র সত্য স্বধর্ম পালন করা। এই স্বধর্ম অর্থাৎ যার যা ধর্ম। যেমন একজন গৃহস্থের ধর্ম সংসার প্রতিপালন করা এবং অন্যায় অত্যাচার না করে সকলের মঙ্গল সাধন করা। ক্রিয়াশীলতাই ধর্ম। যে ব্যক্তি কর্ম করে চলে সেই ধার্মিক। এই ধর্মকে বাদ দিয়ে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। আগে সর্ববিধ ভোগ। ভোগের দ্বারা প্রতিটি মানুষকে নিজের বীর্য, নীতি প্রকাশ করতে হবে। তারপর মুক্তি। তাইতো তিনি বলেছেন জপ তপ মন্ত্র উচ্চারণ নয়, প্রভুর যথার্থ শরণ সেই নিতে পারে "যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ যে 'ধার্মিক।"[৪] তাঁর কথায় প্রতিটি জীব শক্তি প্রকাশের একটি কেন্দ্র। পূর্বজন্মকৃত কর্মফলের দ্বারা প্রত্যেকে শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। এই শক্তি কার্যরূপে রূপান্তরিত হয়। এখন প্রশ্ন কোন কর্ম করা উচিত? ভালো? না খারাপ? তিনি বলেছেন অবশ্যই ভালো কর্ম করা উচিত। এই ভালোকে তিনি দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মুক্ত কামের ভালো ও ধর্ম কামের ভালো। কর্ম করতে গেলে কিছু পাপ আসবেই। প্রতিটি মানুষ দোষে-গুণে সৃষ্ট।

পাপপুণ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট মানুষই দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সীমা প্রয়োজন। মানুষের তিন রকম গুণ বর্তমান। সত্ত্ব রজঃ ও তম।

> "সত্ত্ব প্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃ প্রাধান্যে ভালোমন্দ ক্রিয়া করে, তপঃ প্রাধান্যে নিষ্ক্রিয় জড় হয়।"[৫]

মানুষ কোন গুণের অধিকারী সেটা সে নিজেই সঠিক উপলব্ধি দ্বারা বুঝতে সক্ষম হবে এমনটাই বলেছেন তিনি। সত্ত্ব গুণের অধিকারী মানুষ নিষ্ক্রিয় ও শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তির কেন্দ্রীভূত অবস্থা। তমোগুণ মৃত্যুর চিহ্ন বহন করে। অনীহা অপরিচ্ছন্নতা অপরিষ্কার মনের অধিকারী ব্যক্তি তমোগুণের দ্বারা আবৃত। তমোগুণ সেই গুণ যা তাকে মানুষ হওয়া থেকে, যথার্থ কর্ম করা থেকে পিছিয়ে আনে। তিনি একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। অর্জুন একসময় তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেন। গীতাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এই বিচারে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনা করেছেন। প্রাচ্যের ধর্মে যে উৎসাহ প্রবণতা বর্তমান তা পাশ্চাত্যের মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত, অন্যদিকে প্রাচ্যের মানুষ তমোগুণান্বিত। এখানেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পার্থক্য। তাই প্রয়োজন তমোগুনকে খর্ব করে রজোগুণে গুণান্বিত করে ভারতীয়দের নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। ঈশ্বর লাভের জন্য সুখ দুঃখের পার এই রূপ শান্ত অবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। এখানে সুখ-দুঃখ রূপ যাবতীয় মায়ার বাঁধনকে কাটিয়ে ব্যক্তি উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। অর্থাৎ কর্ম করেই কার্যের বন্ধনকে কেটে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে যেতে হয়।–

> "যেতে হলে আমাদের রাজসিকতার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে; কর্ম সহায়ে তামসিকতাকে কাটিয়ে ঈশ্বরচিন্তা সহায়ে রাজসিকতার দোষ কাটিয়ে যেতে হবে।"[৬]

ভারতের মতো ধর্মবোধ পৃথিবীর কোথাও নেই। কারণ ভারতের ধর্মের ভিত্তি বেদ। আর বেদে ধর্ম ও মোক্ষের চার রূপ বর্তমান যথা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থাৎ চতুর্বিধ উপায় মুক্তির। বিবেকানন্দ বেদকেই ধর্মের আধার রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য বৌদ্ধ ধর্ম ও বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক কিন্তু পার্থক্য উপায়ে। বিবেকানন্দ ধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বধর্ম বা জাতি ধর্মের ওপর বারবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই স্বধর্মই বৈদিক ধর্ম তথা বৈদিক সমাজের ভিত্তি। এই স্বধর্মই একমাত্র উপায়। স্বধর্ম হানিতে দেশের অবনতি আর স্বধর্ম রক্ষার্থেই দেশের ও জাতির উন্নতি। প্রতিটি জাতির একটি জাতীয় উদ্দেশ্য থাকে। তার সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই তাকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য এখানে তিনি বংশগত, জন্মগত জাতির কথা বলেছেন, গুণগত জাতির কথা নয়। যাবতীয় অধিকার যা জাতীয় জীবনে আবশ্যক নয় তার হ্রাস বৃদ্ধিতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু জাতীয় উদ্দেশ্যে আঘাত অসহনীয়। এখানে তিনি তিনটি জাতির উল্লেখ করে বিষয়টি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই জাতি গুলি হল ফরাসি, ইংরেজ ও হিন্দু। ফরাসি চরিত্রের মেরুদন্ড রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সর্ববিধ অত্যাচার তারা সহ্য করতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ তাদের স্বাধীনতায় হাত না পড়ে—

> "জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্যশাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার। এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।"[৭]

ইংরেজদের জাতীয় উদ্দেশ্য ব্যবসাবুদ্ধি–

> "আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ-ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ, হিসাবপত্রে আমি দু-কথা বলব, বুঝব, তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।"[৮]

অন্যদিকে হিন্দুদের জাতীয় উদ্দেশ্য রাজনৈতিক-সামাজিক স্বাধীনতা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক স্বাধীনতা অর্থাৎ 'মুক্তি'। এখানে আঘাত করলেই মুশকিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন এই কারণে পাঠানরা সুস্থির হতে পারেনি। মোঘলরা পেরেছিল কারণ তারা জাতীয় উদ্দেশ্যে আঘাত করেনি। এই জাতীয় উদ্দেশ্যই মহাশক্তি, যার বিকাশ ঘটেছে যুগযুগ ধরে। এর দ্বারা নির্মিত হয়েছে জাতীয় চরিত্র। রাজনীতির নামে জাতীয় চরিত্রের বদল করানো যায় না। তিনি বলেছেন—

> "মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে।"[৯]

তাই তিনি মানুষ হওয়ার কথা বলেছেন। সৎ উদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎ সাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে বলেছেন। সঙ্গে থাকতে হবে শেখার ইচ্ছা। কেউই সব জানে না। শেখার কোন শেষ নেই। শেষ মনে করলেই মৃত্যু, অবনতি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে যা যা ভালো বর্তমান তা শিখে নিতে হবে। তবে—

> "জিনিসটি আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।"[১০]

অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রকে বজায় রেখে সব করতে হবে। তবে উন্নতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য ধরে রাখা সম্ভব।

এর সূত্র ধরে তিনি শরীর ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষ তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। শরীর মন ও আত্মা। এই আত্মা অর্থাৎ চেতন আনন্দময় সত্তা, ব্রহ্ম ব্যতীত ভিন্ন কোন সত্তার অস্তিত্ব আধ্যাত্মবাদীরা স্বীকার করে না। স্বামীজী বলেছেন—

> "যখন বহিরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখি, তাঁকে স্থূল জগত - রূপে দেখা যায়; 'যখন সোজাসুজি মন-বুদ্ধির মাধ্যমে দেখি', তখন সূক্ষ্ম জগত-রূপে দেখা যায়, সূক্ষ্মদেহী দেবতাদির বা ঈশ্বরীয় রূপের দর্শন হয়; তাকেই আবার 'যখন মন-বুদ্ধির পারে গিয়ে প্রত্যক্ষ করি', অদ্বিতীয় নির্গুণ নিরাকার আনন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তা রূপে নিজেরই স্বরূপ-রূপে প্রত্যক্ষ করি।"[১১]

অন্যদিকে স্থানভেদে আবহাওয়া ভেদে বিভিন্ন জাতির শরীরের গঠন বিভিন্ন হয়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে এগিয়ে পাশ্চাত্যেরা। কারণ এদের খাদ্য ভালো, পোশাক পরিচ্ছন্ন, দেশ ভালো এবং সবচেয়ে বড় কথা এরা অল্প বয়সে বিবাহ করে না। আবার তিনি 'পোশাক ও ফ্যাশন' অংশে বলেছেন যেখানে পাশ্চাত্যের ফ্যাশন পোশাকে সেখানে প্রাচ্যের গয়নায়। এর সঙ্গেই চলে আসে পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গটি। প্রাচ্যের পরিছন্নতা অন্তরে পাশ্চাত্যের বাইরে। বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। প্রাচ্যে রান্নার পূর্বে স্নান করে পরিষ্কার জামা পড়ে শুদ্ধ হয়ে রান্নার কাজ সম্পন্ন করা হয়। রান্নার সময় পোশাকে একটু-আধটু দাগ লেগে যেতে পারে তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না কিন্তু পাশ্চাত্যে ফিটফাট হয়ে পরিষ্কার বসনে সব কাজ করতে হবে দেহ ময়লা থাকুক। তাদের এটি আচার। অবশ্য প্রাচ্যে স্নান করে অধর্মের ভয়ে। সেখানে পাশ্চাত্যেরা হাত মুখ ধোয় পরিষ্কার হবে বলে। এখানেই পার্থক্য। কিন্তু প্রকৃত চাই পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড়। আচারের প্রথম কথাই পরিষ্কার হওয়া। এদিকে আচার ছাড়া ধর্ম হবে না। মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা প্রভৃতি কর্ম গোপনে প্রয়োজন আবার ঘর, রাস্তাঘাট, রান্না, রাঁধুনি সকলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন। এর পাশাপাশি তিনি খাদ্যাভ্যাসের কথাও বলেছেন। প্রয়োজন এমন খাদ্য যা পুষ্টিকর অথচ হজম হয় শীঘ্র। অথচ এ সত্যটি সঠিক ধরতে পারে না বলেই এদেশের মানুষের অধিকাংশের রোগ পেটে। তিনি নিরামিষ, আমিষ সংক্রান্ত কোন ধর্মের নিয়মকে স্বীকার করেননি বরং বলেছেন মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বদলাবে খাওয়ার ধরন। যেমন যার জীবনের উদ্দেশ্য শুধু ধর্মজীবন তার নিরামিষ খাওয়া প্রয়োজন হলেও যাকে খেটেখুটে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয় তার আমিষ আহার অত্যন্ত প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে স্বাস্থ্য, পোশাক, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাযর কি

কোন অর্থ আছে? বিশেষত যেখানে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা বলব আছে কারণ পেট খালি রেখে অপরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে কখনই ধর্ম হয় না। মোক্ষ লাভের জন্য প্রয়োজন সুস্থ শরীরে পরিষ্কার পোশাকে পরিষ্কার মনের অধিকারী হওয়া।

এবার বলা প্রয়োজন ঐতিহ্য সেই বস্তু যা যুগ যুগ ধরে দেশ ও জাতির অন্তরে বহমান। অতীতের কোনো বিশেষ জিনিসকে বর্তমানে গ্রহণ করে কোন জাতির স্বতন্ত্র পরিচিত নির্মাণই এর মূল কেন্দ্র। এর মাধ্যমে জাতি তার জাতীয় উদ্দেশ্য তথা লক্ষণকে অনুসন্ধান করতে পারে এবং দৃঢ় ভিত্তি দিতে পারে। অবশ্যই তাকে বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। ভারতের মূল ভিত্তি বা জাতীয় উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তাঁর আধ্যাত্মিকতা দ্বারা। এই আধ্যাত্মিকতার মূল রূপটি হল বেদ। বিবেকানন্দের মতে—

> "ধর্মাচরণ বিষয়ে বেদের কর্তৃত্বই সার্বভৌম, অন্যান্য শাস্ত্রের মূল্য ততটাই যতটা সেগুলি বেদের অনুসরণ করেছে। সর্বকালে সর্ব দেশে সর্ব মানবের উপরে বেদের কর্তৃত্ব।... জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড এই দুই ভাগে বেদ বিভক্ত। সামাজিক রীতি ও প্রথাসমূহ কর্মকান্ডের উপর আধারিত, তাই সেগুলি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে ও চলবে। প্রচলিত রীতিনীতির বিকৃতি ঘটেছে, হিন্দুধর্মের অবনমন হয়েছে-গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এই বিভাজন...।"[১২]

ধর্মের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে মানুষের সঙ্গে যুক্ত সব কিছুকেই তিনি ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখেছেন ও বিচার করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য ব্যক্তির চরিত্র, আচার, বিধি, পোশাক, খাদ্যাভাস সমস্ত কিছুরই সঠিক ধারণা ও অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তি তথা জাতির সঙ্গে সংযুক্তি সাধন প্রয়োজন। ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কিছুরই সঠিক অভ্যাস ও পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি তথা জাতির সঠিক বোধ নির্মিত হবে।

তাই বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন ধর্মই প্রাচ্যকে তার সঠিক মান প্রদান করবে। ভারতীয়দের মূল ভিত্তি তার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু গ্রহণের কথাই তিনি বলেননি বরং গ্রহণ ও বর্জনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে নতুনকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। ঐতিহ্যের মূল স্রোতেই নতুন এসে মিশবে এবং তার ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে জাতিকে তথা দেশকে সমৃদ্ধ করবে। ভয়হীন ভাবে পাশ্চাত্যের ভালোকে মিশিয়ে নিতে হবে প্রচলিত অভ্যাসে। তিনি ধর্মের ধারণাকে সীমাবদ্ধ না করে তাকে মুক্তি দিয়েছে দেশের, জাতির রীতিনীতি, পোশাক, খাদ্য সকলের মিলিত ক্ষেত্রে। আজকের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে যেখানে বারেবারে থমকে দাঁড়াতে হয়, সমাজ-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পালাবদলে যেখানে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান করতে পারেনা, যেখানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে উপস্থাপনের লড়াইয়ে মানুষ খন্ডিত, যেখানে ক্রমব্যস্ততার যুগে মানুষ হারাতে বসেছে তার স্বকীয়তাকে, বদলে ফেলেছে তার খাদ্যাভাস, রীতিনীতি, পোশাকের ধ্যানধারণা, যেখানে আপাতভাবে এগুলিকে এক স্রোতে মিলিত করা যায়না, সেখানে একবার আমাদের প্রয়োজন ফিরে তাকানোর। সমস্ত কিছুর একাত্মতায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক মনন গড়ে তোলা সম্ভব। নিজের ঐতিহ্য সর্বদাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক বোধ, সঠিক মেলবন্ধন। আজকের একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে বিষয়টিকে অন্যরকম শুনতে মনে হলেও প্রয়োজন একবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর। শুধু একবার চিন্তার পরিসরে বিষয়টিকে নিয়ে আসতে পারলে তো ক্ষতির কিছুই নেই। প্রাসঙ্গিকতাকে তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, নিমাই সাধন, (সম্পাদনা), 'শাশ্বত বিবেকানন্দ', ডিয়েটমার রদারমন্ড, 'বিবেকানন্দের চিন্তায় ঐতিহ্যবাদ ও সমাজবাদ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৮, পৃ. ১৫১
২. বসু, প্রসূন, ও শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরিকল্পনা ও সম্পাদনা), বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন,

কলিকাতা, ২০তম মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৮১

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. তদেব

৬. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, (সম্পাদক), 'বিবেকানন্দ', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, চতুর্দশতম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৪৩

৭. বসু, প্রসূন, ও শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরিকল্পনা ও সম্পাদনা), বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ২০তম মুদ্রণ: জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৮৩

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী, (সম্পাদক), 'বিবেকানন্দ', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, চতুর্দশতম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৪৬-১৪৭

১২. বসু, নিমাই সাধন, (সম্পাদনা), 'শাশ্বত বিবেকানন্দ', ডিয়েটমার রদারমন্ড, 'বিবেকানন্দের চিন্তায় ঐতিহ্যবাদ ও সমাজবাদ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: জুলাই ২০০৮, পৃ. ১৫১